**তারিখঃ ১০ নভেম্বর ২০১৬**

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

**ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারার মামলায় গ্রেফতার এবং পুলিশ রিমান্ডে নির্যাতন নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত হাইকোর্টের প্রদত্ত নির্দেশনা আপীল বিভাগে বহাল - গত ২৪ মে ২০১৬ইং তারিখ প্রদত্ত রায়ের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ**

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারার মামলায় গ্রেফতারের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং পুলিশ রিমান্ডে নির্যাতন নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত হাইকোর্টের প্রদত্ত নির্দেশনা আপীল বিভাগে বহাল রয়েছে। এ সংক্রান্ত গত ২৪ মে ২০১৬ইং তারিখ প্রদত্ত রায়ের পূর্ণাঙ্গ রায় গত ১০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

১৩ বছর আগে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের আপিল খারিজ করে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে চার সদস্যের আপীল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ গত ২০১৬ সালের ২৪ মে তারিখে রায় দেন। গত ১০ নভেম্বর ২০১৬ সুপ্রিমকোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ৩৯৬ পৃষ্ঠার এই পূর্ণাঙ্গ রায়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য ১০ দফা ও বিচারক, ট্রাইব্যুনাল ও ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতি নয় দফা নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং তা অবিলম্বে পুলিশের সব থানায়, ইউনিট ও কর্মকর্তাদের কাছে প্রচার করার জন্য পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ও র‍্যাবের মহাপরিচালককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারিক আদালতের জন্য দেওয়া নীতিমালা অবিলম্বে তাঁদের কাছে বিতরণ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে রায়ের অনুলিপি আইন মন্ত্রণালয়ের দুই সচিব ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবকে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট।
রায়ে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি এবং আসামীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হবে তা বলা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকার যেন ক্ষুন্ন না হয় সে ব্যাপারেও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
রায় অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্তব্য হবে,

- উঁচু মানের পেশাগত দায়িত্বশীলতা দিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মানুষকে বেআইনি কাজ থেকে রক্ষা করবেন এবং কমিউনিটিকে সেবা দেবেন এবং সব সময় আইন মেনে চলবেন।
- দায়িত্ব পালনকালে মানুষের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করবেন এবং ব্যক্তির মানবাধিকার সমুন্নত রাখবেন।
- অত্যন্ড় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কেবল দায়িত্ব পালনে আবশ্যক হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।
- সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কেবল সম্মানই করবে না, সুরক্ষাও করবে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য নির্দেশনা,

১) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের পর তাৎক্ষণিক একটি মেমোরেন্ডাম (স্মারক) তৈরি করবেন। ওই কর্মকর্তা অবশ্যই গ্রেপ্তার ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন, যেখানে তারিখ ও গ্রেপ্তারের সময় উল্লেখ থাকবে।
২) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলে ওই ব্যক্তির নিকটাত্মীয়কে বিষয়টি অবহিত করতে হবে। নিকটাত্মীয়র অনুপস্থিতিতে গ্রেপ্তার ব্যক্তির পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর কোনো বন্ধুকে জানাতে হবে। যথাসম্ভব দ্রুত সময়ে বিষয়টি জানাতে হবে। এ কাজে ১২ ঘণ্টার বেশি দেরি করা যাবে না। গ্রেপ্তারের সময়, স্থান এবং কোথায় আটক রাখা হয়েছে, তা-ও জানাতে হবে।
৩) গ্রেফতারের কারণ, যিনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে গ্রেফতার করার জন্য তথ্য দিয়েছে বা অভিযোগ দিয়েছে তার নাম ও ঠিকানা, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আত্মীয় বা বন্ধু যাকে গ্রেফতারের তথ্য জানানো হয়েছে তার নাম ও পরিচয় এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যে কর্মকর্তার হেফাজতে তার পরিচয় কেস ডাইরীতে লিখতে/এন্ট্রি করতে হবে।
৪) ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩ ধারায় উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো ব্যক্তিকে ৫৪ ধারায় আটক করা যাবে না।
৫) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য কাউকে গ্রেপ্তার করার সময় নিজের পরিচয় প্রকাশ করবেন। যদি দাবি করা হয়, তবে যাঁকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের পরিচয়পত্র দেখাতে হবে।

৬) গ্রেপ্তার ব্যক্তির শরীরে যদি কোনো রকম ইনজুরির চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ইনজুরির কারণ ও বর্ণনা লিপিবদ্ধ করবেন। ওই ব্যক্তিকে কাছের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবেন এবং উপস্থিত চিকিৎসকের সনদ সংগ্রহ করবেন।

৭) যদি কোনো ব্যক্তিকে তাঁর বাসা বা ব্যবসায়িক স্থান থেকে গ্রেপ্তার করা না হয়, তাহলে ওই ব্যক্তিকে থানায় আনার ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর স্বজনকে লিখিতভাবে বিষয়টি জানাতে হবে।

৮) গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি চাইলে কাছের স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা আইনজীবীর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ চাইলে তা দিতে হবে।

৯) ফৌজদারি কার্যবিধির ৬১ ধারা অনুযায়ী যখন কোনো ব্যক্তিকে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়, তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা তাঁর প্রতিবেদনে কেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম শেষ করা সম্ভব হয়নি, তা ১৬৭(১) ধারায় বর্ণনা করবেন। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ কেন সুনির্দিষ্ট বলে মনে করছেন, তা-ও উল্লেখ করতে হবে। কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কেস ডায়েরিও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তর করবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক ও ট্রাইব্যুনালের প্রতি নীতিমালা অনুসারে অভিযোগ আমলে নেওয়ার বিষয়ে বিচারিক আদালতের জন্য নয় দফার গাইডলাইন দিয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এর মধ্যে রয়েছে:

১) যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কার্যবিধির ১৬৭(২) ধারা অনুসারে কেস ডায়েরি ছাড়া উপস্থাপন করেন, তবে ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ওই ব্যক্তিকে ধারা ১৬৯ অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি বন্ড নিয়ে মুক্তি দেবেন।

২) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আটক কোনো ব্যক্তিকে যদি অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট মামলায় গ্রেপ্তার দেখাতে চায়, সে ক্ষেত্রে ঐ মামলার ডায়েরির অনুলিপিসহ তাঁকে আদালতে হাজির করা না হলে আদালত তা মঞ্জুর করবেন না। গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনের ভিত্তি না থাকলে বিচারক আবেদন খারিজ করে দেবেন।

৩) ওই শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যদি কোনো ব্যক্তিকে ১৬৭(২) ধারা অনুযায়ী আটকের ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করা না যায়, এবং ওই মামলা যদি দায়রা আদালত বা ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হয়, তবে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৩৪৪ ধারা অনুযায়ী রিমান্ডে পাঠাতে পারবেন; যা একবারে ১৫ দিনের বেশি হবে না।

৪) পুলিশ প্রতিবেদনে (ফরোয়ার্ডিং) বর্ণিত কারণ যদি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সন্দেহজনক মনে হয় এবং কেস ডায়েরিতে বর্ণিত অভিযোগ অথবা তথ্য যদি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কেস ডায়েরিতে যদি ওই ব্যক্তিকে আটক রাখার জন্য তথ্য থাকে, ম্যাজিস্ট্রেট তার নিজ বিবেচনায় ওই ব্যক্তিকে পুনুরায় আটক রাখার জন্য আদেশ দিতে পারবেন।

৫) ম্যাজিস্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে বিচারিক হেফাজতে রাখার জন্য আদেশ দিবেন না যদি পুলিশের ফরোয়ার্ডিং প্রতিবেদনে প্রকাশ পায় যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নিবর্তনমূলক আটকের উদ্দেশ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৬) ১৬৭ ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোনো আদালতে হাজির করা হলে শর্তগুলো পূরণ করা হয়েছে কি না, সেটা দেখা ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারকের দায়িত্ব।

৭) যদি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এটা বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যেকোনো সদস্য বা কর্মকর্তা (যাঁর কোনো ব্যক্তিকে আইনত কারারুদ্ধ করার ক্ষমতা আছে) আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কার্যক্রম করেছেন, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ২২০ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

৮) যখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রিমান্ডে বা তাঁর হেফাজতে নেন, তখন তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে নির্ধারিত সময় শেষে তাঁকে আদালতে হাজির করা। যদি পুলিশি প্রতিবেদন বা অন্য কোনোভাবে জানা যায় যে গ্রেপ্তার ব্যক্তি মারা গেছেন, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির (ভিকটিম) শারীরিক পরীক্ষার নির্দেশ দেবেন। যদি দেখা যায়, মৃত ব্যক্তির দাফন হয়ে গেছে, সে ক্ষেত্রে মরদেহ উঠিয়ে মেডিকেল পরীক্ষার নির্দেশ দেবেন। যদি মেডিকেল বোর্ডের প্রতিবেদনে দেখা যায়, নির্যাতনের কারণে মৃত্যু হয়েছে, তবে ম্যাজিস্ট্রেট ২০১৩ সালের হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী ওই কর্মকর্তা, সংশি- ষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যাঁর কাস্টডিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেবেন।

৯) যদি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপাদান বা তথ্য থাকে যে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩-এর ধারা ২-এ বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি হেফাজতে নির্যাতন বা মৃত্যুর শিকার হয়েছেন, সে ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিকটস্থ চিকিৎসকের কাছে পাঠাবেন। আর মৃত্যুর ক্ষেত্রে আঘাত বা মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়ার জন্য মেডিকেল বোর্ডে পাঠাবেন। যদি মেডিকেল পরীক্ষায় দেখা যায় যে আটক ব্যক্তিকে নির্যাতন করা হয়েছে অথবা নির্যাতনের কারণে মৃত্যু হয়েছে, এ ক্ষেত্রে বিচারক সংশিণ্টষ্ট আইনের ৪ ও ৫ ধারায় মামলা দায়েরের জন্য অপেক্ষা না করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ১৯০(১)(সি) ধারা অনুযায়ী অপরাধ আমলে নেবেন।

মামলায় রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানীকারী জ্যৈষ্ঠ আইনজীবীগণ **ড. কামাল হোসেন বলেন**, "এই রায়ের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা, বিশেষত পুলিশের দ্বারা যথেচ্ছ গ্রেফতারের এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেকোনো ধরণের পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত অধিকারগুলোর রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। বিগত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এই রায়ের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। আশা করা যায়, যে আদালতের এ যুগান্তকারী রায়ের পর বহুল আকাঙ্খিত পুলিশ সংস্কার সম্ভব হবে এবং পুলিশের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন আইন প্রণীত হবে।"

মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী **এডভোকেট ইদ্রিসুর রহমান বলেন**, "বহুদিন পর আমরা গণমানুষের অধিকার বাস্তবায়নের রায় পেয়েছি। এ রায়ের ফলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং তা যেন লংঘিত না হয় তার নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী এবং এ মামলার বাদী ও ব্লাস্টের তৎকালীন উপদেষ্টা **ড. শাহদীন মালিক** , "এ মামলা শুরু হয়েছিল সুদূর ১৯৯৮ তে - পুলিশের নির্মম নির্যাতনে একজন মেধাবী ছাত্র রুবেলের মৃত্যুর পর। উদ্দেশ্য ছিল রুবেলের মতো আর কেউ যেন নিহত না হয়। ইদানীং পুলিশী নির্যাতন বেড়েছে। তবে আশা হল, এই রায়ের ফলে পুলিশী নির্যাতন কমিয়ে আমরা সভ্য সমাজে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে যাব।"

**পটভূমিঃ**

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয় এবং গোয়েন্দা বিভাগের কার্যালয়ে তার মৃত্যু হয়। সীমা চৌধুরী নামে ১৮ বছরের এক তরুণী চট্টগ্রামের রাউজানে পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণের শিকার হয় ও মৃত্যুবরণ করেন। অরুন চক্রবর্তী নামে আরো এক যুবক মালিবাগ থানার পুলিশ হেফাজতে মারা যান। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), আইন সালিশ কেন্দ্র (আসক), সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের প্রাক্তণ সভাপতিসহ আরো কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগে একটি রীট পিটিশন দায়ের করেন। এই মামলায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা এবং ১৬৭ ধারার অপপ্রয়োগ চ্যালেঞ্জ করা হয়। আইন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশের মহা পরিদর্শক, উপ-মহা পরিদর্শক, সহকারী পুলিশ সুপারসহ ৫ জনকে বিবাদী করে এই মামলা দায়ের করা হয়।

মামলায় রুবেল হত্যার মর্মান্তিক ঘটনায় বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের অধীনে বিচারবিভাগীয় অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্টে পেশকরা ১১টি সুপারিশমালার ভিত্তিতে আদালতের কাছে দিকনির্দেশনার আবেদনও জানানো হয়। পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্ট ১৯৯৮ সালের ২৯ নভেম্বর সন্দেহবশতঃ কাউকে গ্রেফতার এবং তদন্তের নামে রিমান্ডে এনে শারীরিক নির্যাতন করা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে কেন নির্দেশ দেয়া হবেনা সে মর্মে রুল নিশি জারি করেন। পরবর্তীতে ৭ই এপ্রিল ২০০৩ তারিখ শুনানি শেষে বিচারপতি হামিদুল হক চৌধুরী এবং বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সংশোধনের জন্য একটি যুগান্তকারী রায় প্রদান করেন এবং গ্রেফতার ও রিমান্ডের ক্ষেত্রে ১৫টি নির্দেশনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ বিগত ২০০৪ সালে লিভ টু আপীল গ্রহণ ও মঞ্জুর করলেও হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ স্থগিত করেনি। এরপরে, দীর্ঘ ১৭ বছর পরে বিগত ২৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে মামলাটি আপীল বিভাগের শুনানীর তালিকায় ওঠে।

পরবর্তী সময়ে, গত ২১ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ, রাষ্ট্রপক্ষের কাছে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা জানতে চান এবং ৯ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তা লিখিত আকারে আদালতকে অবহিত করতে অ্যাটর্নি জেনারেলকে নির্দেশ দেন। এরপরে, বিগত ১৭ই মে ২০১৫ তারিখে শুনানীর পর ২৪ মে ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে গঠিত ৪ সদস্যের সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এই যুগান্তকারী রায় প্রদান করেন।

বার্তা প্রেরক:
মাহবুবা আক্তার
উপ- পরিচালক (এডভোকেসী এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
ইমেইল: mahbuba@blast.org.bd
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩